ঈর্ষা করি

সমরেশ মজুমদার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে একসময় আমি খুব হিংসে করতাম। তখন এম. এ. পাশ করে বেকার বসে। একটু আধটু লেখালেখি করি। সে লেখা কোনো বড় কাগজে ছাপা হলে এখন লজ্জা পেতাম। কিন্তু সেটা ওই সময় বুঝতাম না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে তখন আমি জানতাম কবি হিসেবে। কবিদের খুব একটা খাতির করার প্রয়োজন বোধ করতাম না বলে হিংসে করার প্রশ্ন উঠত না। সে সময় 'আত্মপ্রকাশ' পড়লাম।

পড়তে পড়তে হিংসেটা এল। মনে হচ্ছিল এই উপন্যাসের নায়ক আমি এবং আমার সমস্ত ঘটনা সুনীল লিখে ফেলেছেন। লেখার ভঙ্গিটা এমন আন্তরিক এবং স্বাভাবিক যে আমি কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাচ্ছি না। এরকম একটা উপন্যাস লেখা আমার স্বপ্নে ছিল অথচ সুনীল সেটা লিখে ফেললেন। রাতারাতি একটা উপন্যাসের কিছুটা পড়তেই বুঝলাম আমি সুনীলের ধারে কাছে যেতে পারছি না। অক্ষমতা থেকে হিংসে আসে।

তারপর সুনীল দু'হাতে লিখতে শুরু করলেন। দেশে ধারাবাহিক উপন্যাস, আনন্দমেলায় উপন্যাস, পুজোর উপন্যাসত্রয়, ফিচার, কবিতা একসঙ্গে যখন লিখে যাচ্ছেন তখন ঈর্ষা বাড়লো। মনে হচ্ছিল, সুনীল বেশি বেশি সুযোগ পাচ্ছেন। ওরকম সুযোগ পেলে আমিও লিখতে পারতাম। ওই বয়সটায় মনে হয় সুযোগ পেলে পাথর চটকে জল বের করতে পারি।

তারপর একসময় আমি 'দেশে' ধারাবাহিক উপন্যাসের সুযোগ পেলাম। সুনীল যে সময় 'সেই সময়' লিখছেন। আমি 'উত্তরাধিকার'। দশ মাসের মধ্যে আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। গল্প মাথায় আসছে না, লিখতে গেলে আতঙ্ক হয় কী লিখবো। অন্য গল্প উপন্যাস সব শিকেয় উঠল। তাড়াতাড়ি শেষ করলাম অক্ষমতা ঢাকতে। সুনীল লিখে যাচ্ছেন জমিয়ে। তার একবছর পর যখন আমি 'কালবেলা' লিখছি তখনও সুনীলের উপন্যাস চলছে। ওই উপন্যাস লিখে সুনীল বঙ্কিম পুরস্কার পেয়েছেন, অসাধারণ কাজের জন্যে তাঁর খ্যাতি বেড়েছে।

আমার সব হিংসে উবে গেল। লজ্জিত হলাম। কতখানি ক্ষমতা থাকলে একটা মানুষ এক হাতে একই সঙ্গে এতরকম চরিত্র ঘটনা এবং বিভিন্ন মেজাজের লেখা লিখতে পারেন তা প্রকৃত লেখার মধ্যে না এলে কেউ বুঝতে পারবে না। আমার নিজের মনে হত বেশি লিখে সুনীল নিজের ক্ষতি করছেন। ভুল মনে হত। সুনীল যদি বছরে একটা উপন্যাস লিখতেন তাহলে সেটা যে মহান টহান হতো তার কোন যুক্তি নেই। হয়তো কিছু অবিচার হয় কিন্তু এতগুলো লিখছেন বলেই ভাল ভাল লেখা ওঁর হাত দিয়ে আচম্বিতে বেরিয়ে আসে।

সারাদিনে ওঁর লেখার সময়টা খুব বেশি নয়। রাত্রে লেখেন না। পান করে তো নয়ই। আড্ডা মারতে মারতে দিব্যি লিখে যেতে পারেন। কাগজ, স্থান নিয়ে খুঁতখুঁতুনি নেই। কেউ লেখা চাইলে না বলতে বড় একটা দেখিনি।

সুনীলের সঙ্গে যখন ভাল আলাপ হল দেখলাম তিনি নিজেই ব্যবধান কমিয়ে আনলেন। যখনই যে অনুরোধ করেছি না বলেননি। কিছুদিন আগে আমরা উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলাম। তিন-চারদিনে ওঁকে একটা লাইনও লিখতে দেখিনি। বাইরে গেলে সুনীল লেখেন না। অথচ লেখার টেবিলে বসলে যে লেখাটা আমি দু'দিন কলম চিবিয়ে লিখব সেটা উনি একঘন্টায় তরতরিয়ে নামাবেন।

সুনীলের লেখায় যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় সেটা প্রসাদগুণ। এত স্পষ্ট স্বরে সত্যি কথা বলে যাওয়া, আটপৌরে ভঙ্গিতে অনেক ভারী কথাকে সহজ করে দেওয়া—এর জন্যে ক্ষমতা থাকা দরকার। বারংবার বিষয় বদলেছেন সুনীল, বলার ভঙ্গিও পাল্টেছে। নিজেকে ভেঙেচুরে নতুন করে পরিবেশন করার চেষ্টা

সবসময় দেখতে পাই।

সুনীল যে, কোনো জায়গায় যে, কোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। কোনো-রকম দাম্ভিকতা দেখিনি। গান চমৎকার। রূপনারায়ণপুরের বাংলোয় অথবা ডুয়ার্সের চা বাগানে মাঝরাত্রে ওঁর গান ভোলার নয়।

ইদানীং সুনীলকে আবার ঈর্ষা করতে শুরু করেছি। কারণ ওঁর কোনো শত্রু নেই। থাকলেও তারা নিজেদের প্রকাশ করে না। কারণ সুনীলের মুখে অন্যের নিন্দে শোনা যায় না। খুব কটু ব্যাপারও তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। অপ্রিয় প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার কায়দা সুনীলের মত আয়ত্ত করতে দেখিনি কাউকে। কোনো দলবাজির মধ্যে সুনীল নেই।

নিজেকে এমনভাবে নিরাসক্ত করতে চেষ্টা করেও পারিনি। সুনীল পেরেছেন। ঈর্ষা সেই কারণে।